পালপ্রদীপিকা

রজত পাল

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসের পালযুগ সম্পর্কে আমাদের ধারণা মূলত গোপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালে সীমাবদ্ধ। প্রায় বাইশজন রাজা এই বংশে যে প্রায় চারশো পঞ্চাশ বছর ধরে রাজত্ব করেছেন সে-কথা আমরা মনে রাখি না। যেমন মনে রাখি না যে, পালেরা কেবল বাংলার রাজা নন, তাঁরা অবিভক্ত বাংলা-সহ বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম এবং উত্তরপ্রদেশের বিরাট অংশ জুড়ে রাজত্ব করেছেন। কখনও সেই রাজত্বের সীমানা উড়িষ্যা হয়ে আরও দক্ষিণে রামেশ্বরম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁরা ছিলেন সম্রাট। তাঁদের অধীনে বিভিন্ন রাজাদের রাজত্ব ছিল। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ নিয়ে (মূলত কনৌজ) প্রতিহারদের সাথে পালেদের দ্বন্দ্ব থাকলেও পূর্বভাগ অধিকাংশ সময়েই পালেদের অধীনে ছিল। পুরীর মতন বারাণসী যে বাঙালির কাছে আপন তীর্থভূমি, তার সূচনা পালেদের সময়েই হয়েছিল।

পালেদের প্রায় অর্ধ সহস্রাব্দের এই ইতিহাসের অনেক অংশই আমাদের অজানা রয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক ভূগোল কখনোই স্থায়ী হয় না। পার্শ্ববর্তী রাজারা শক্তিশালী হলে, বা সম্রাট দুর্বল হলে, অথবা সাম্রাজের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজ্যসীমানার পরিবর্তন হয়। একই রকম ভাবে রাজবংশের ভেতরের ইতিহাসও সর্বদা সরলরৈখিক পথে গমন করে না। আমরা জানি না সঠিক কী কারণে সম্রাট ধর্মপালের জ্যেষ্ঠপুত্র ত্রিভুবনপালকে বাদ দিয়ে কনিষ্ঠ দেবপাল সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক তেমনিই জানা নেই কীভাবে ধর্মপালের বংশের পরিবর্তে গোপালের অপর পুত্র বাকপালের বংশধর রাজ্যশাসনের অধিকার অর্জন করেছিলেন দেবপালের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই।

আমরা সাধারণত মনে করে থাকি যে, বাংলায় বল্লালসেনের উত্থানের সঙ্গে পালেদের পতন হয়েছিল। কিন্তু এ-কথা সত্য নয়। বাংলায় সেনেরা আধিপত্য বিস্তার করলেও বিহার অঞ্চলে পালেদের শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল বখতিয়ার খিলজির আক্রমণের সময় পর্যন্ত। পাশাপাশি প্রায় দেড়শো বছর রাজত্ব করার পরে বখতিয়ারের আক্রমণের সময়ে একই সঙ্গে বিহারে পাল এবং পশ্চিমবঙ্গে সেনেরা বিনষ্ট হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে সেনেরা অবশ্য আরও কিছুকাল রাজত্ব চালিয়েছিল এবং গৌড় পুনর্দখলের প্রয়াস করেছিল। কিন্তু সেই ইতিহাস ভিন্ন।

কেমন ছিল পালেদের সময়ে বঙ্গ-বিহারের সমাজ? কী ছিল ধর্মভাবনা? পালেরা আদিতে বৌদ্ধ হলেও সমাজের সকলেই কি সেই ধর্ম পালন করতেন? না কি ভিন্ন ভাবধারার স্রোত বয়ে চলত সমাজের গভীরে? কেমন ছিল রাষ্ট্রকূট

এবং প্রতিহারদের সাথে পালেদের সম্পর্ক? সেদিনের ভারতের তিনমাথায় থাকা এই ত্রিশক্তি কি কেবলই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে গিয়েছিল? না কি গড়ে উঠেছিল পারস্পরিক আত্মীয়তা? কী ছিল ত্রিশক্তির বাইরে অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজবংশগুলির অবস্থা সেই সময়ে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই উপন্যাসে।

আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত পাঠকেরা জ্ঞাত যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতিরিক্ত কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার থেকে বিরত থাকার প্রয়াস করে থাকি আমি। অনেক বেশি নির্ভর করি পুথি, মুদ্রা, তাম্র বা প্রস্তর লিপির ওপরে। যে-অংশের ইতিহাস প্রাপ্ত হয়ে ওঠেনি এ-পর্যন্ত, কেবল সেটুকু অংশে যুক্তিসংগত ইতিহাসের অনুমান করে থাকি মাত্র। এই উপন্যাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এটি পালেদের সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। ‘গৌড়চন্দ্রিকা’ নামে পালেদের অন্তিমপর্বের একজন সম্রাট রামপালের আখ্যান লিখেছিলাম পূর্বে। বর্তমানে এটি পালেদের প্রথম সাতজন সম্রাটের কাহিনি। পাঠকদের ভালো লাগলে পালেদের মধ্যবর্তী এবং অন্তিম পর্বের ইতিহাস রচনার ইচ্ছা রইল।

কাহিনিটির প্রথম অংশ *অরণ্যমন শারদীয়া পত্রিকা*-য় প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত অরণ্যমনের কর্ণধার চিরঞ্জীৎ দাসের আগ্রহে এবং যত্নেই কাহিনিটি সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। বই আকারে এটি প্রকাশ করার জন্য চিরঞ্জীতের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল।

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝানবখানে
অপইঠান মহাসুহলীলে দুলখ পরম নিবাণেঁ
বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ।।

"উচাই তুলে ধর রে ডোম্বী, উচাই তুলে আগগাই চল", নিশিকালো অন্ধকারে নিকষ কালো সুঠাম দেহের পুরুষটি তাড়া দিল সঙ্গিনীকে।

"আর পারি না ডোম্ব, কী বড়োই বিসম ভার", সঙ্গিনী অতিশয় হাঁফিয়ে উঠেছে।

"চল চল কেনে! হোই হোথা শুনছিস দারিক ঠাউরের চাঁচর হতে লেগেছে। আর এট্ঠু গেলেই হবেক রে। হেই বেচারির প্রাণটা বাঁচে বটে। চল চল, ডোম্বী। এট্টুস চল রে", ডোম্ব উৎসাহ দেয় সঙ্গিনীকে।

"কারে না কারে তুলে আনলি পানি থেইক্যে। এ মরা নিয়া যাইয়ে কঁচু হবেক? তোর যতক আচ্চজ্জ কাম, ডোম্ব!"

ডোম্বিনী বেজায় অখুশি হয়ে রয়েছে। কামকাজ সেরে দিনের শেষে বেশ ফিরে আসছিল জঙ্গলের পথ দিয়ে। মা গঙ্গার পাড়ে খানিক জিরিয়ে নিয়ে হাত-পা মার্জন করে বাড়ি ফিরবে। শিকার আজকে ভালোই হয়েছে জঙ্গলে। রাতে কাঠের আগুনে ঝলসে নিয়ে তৃপ্তি করে আহার করবে হরিণের মাংস। সঙ্গে যবের দানার রুটি।

ডোম্ব গিয়েছিল জলের ধারে, জিরিয়ে নিচ্ছিল ডোম্বিনী। হরিণের পো মরার আগে বেশ ছুটিয়ে ছেড়েছে আজ। পাক্কা দুই প্রহর ধরে ফাঁদ পেতে, দুই দিক দিয়ে তাড়া করে শেষে আহত করা গিয়েছে তাকে। তারপর খানিক জিরিয়ে নিয়ে নেমেছে নদীর জলে হাতমুখ ধুয়ে নিতে। এরই মাঝে পাড় থেকেই ডোম্ব ডাক দিয়েছিল, "ছুট্টে আয়, ডোম্বী, এ যে মানুষের পো!"

দৌড়ে গিয়ে ডোম্বী দেখে নদীর পাড়ের এক গাছের থেকে জলে নেমে আসা মোটা শিকড়ে আটকে রয়েছে এক মানুষের দেহ। হাতে-পায়ে আঘাতের চিহ্ন। প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। ডোম্ব ছুঁয়ে বলল হালকা শ্বাসের ধারা নাকি বইছে দেহে। মাথায় হাত দিয়ে খানিক বসে থেকে দু'জনে ঠিক করল জঙ্গলের অন্যদিকে মল্লিনাথের আখড়ায় নিয়ে যাবে এই দেহ ধরাধরি করে। মল্লিনাথ বড়ো সিদ্ধ মানুষ। জানেন নানা তুকতাক, জড়িবুটির রহস্য। যদি বাঁচে এই মানুষটা!

সেই মৃতপ্রায় মানুষটাকে এতটা পথ দু'জনে বয়ে আনতে হাঁফিয়ে উঠেছে দু'জনেই। ডোম্বর চেয়ে ডোম্বী হাঁফিয়েছে বেশি। ডোম্বীর ক্লান্তির চেয়েও বেশি রাগ হয়েছে হরিণের মাংসটাকে ফেলে আসতে হয়েছে বলে। যদিও বুদ্ধি করে কাপড়ে পেঁচিয়ে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছে, যাতে শিয়াল-কুকুরে না খেয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মাংসখেকো পাখিদের হাত থেকে কি বাঁচবে

সেই মাংস? আজ যদি সেই মাংস আর ফিরে গিয়ে না পায়, তাহলে ডোম্বর এই দিন কি সেই দিন করে দেবে ডোম্বী।

ডোম্বী বসে পড়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে। বলে ওঠে, "এইহানে এট্‌ঠু বসি বরং। তুই কেনে গিয়ে আখড়ায় খবর দে। আরও দু'জন লোক ডেইকে নিয়ে আয়। আমি আর পারি নে।"

এই পরামর্শ ডোম্বর পছন্দ হল। বলল, "তা-ই ভালো। তুই বোস। আমি ডেইকে আনি।"

দুঃখে সুখে এক করিয়া ভুঞ্জই ইন্দী জানী
স্বপরাপর না চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী।

ডোম্ব চলে যেতেই ডোম্বী আখড়ার গানের সুর শুনতে পেল। এই গান ডোম্বীর চেনা। শিশুপা মল্লিনাথের আখড়ায় আগেও কয়েকবার এসেছে ডোম্বী। এসেছে ডোম্বের সঙ্গেই। এ নাকি সহজগান। সহজ সাধনার অঙ্গ এই গান। সুর, তাল নিয়েও কথা হয়েছিল। বরাড়ী, না জানি পটমঞ্জরী— কী যেন এক রাগ এই গানের। দারিকপাদ নামে এক সহজ সাধকের গান। যারা এই মতে সাধনা করে, তারা সন্ধ্যা হলে কাজের শেষে মাঝেমধ্যে এই গান করে কয়েকজন মিলে; মাদলে তাল তোলে কেউ-কেউ।

এই গানের অর্থও বুঝিয়ে দিয়েছিল আগের দিন মল্লিনাথের এক চেলা। বলেছিল, "দুঃখ-সুখকে এক করে জ্ঞানী ইন্দ্রিয় ভোগ করে থাকে। স্বপর আর অপর বলে আলাদা কিছু দারিকপাদ চেনে না, সে সকল অনুত্তর মানে।"

আমাদের নাকি পাঁচ ইন্দ্রিয়। চোখ, নাক, মুখ এসব দিয়ে আমরা ভোগ করি। কিন্তু জ্ঞানী সব ভোগ করেও সুখ-দুঃখে কাতর হয় না। এই গান নাকি দারিকপাদ তৈরি করেছেন। এ গান সাধনভজনের। দারিকপাদের মতন এমন কয়েকজন আছেন যারা এমন ধরনের সাধনার চাঁচর গান তৈরি করতে পারে। একটু আগে গানের যে কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল সেটা ঘুরছিল ডোম্বীর মনে— কী হবে মন্ত্রে, কী হবে তন্ত্রে, কী হবে ধ্যান ব্যাখ্যায়! মহাসুখলীলা প্রতিষ্ঠিত না হলে নির্বাণ হবে না। দারিকপাদ গগনে পরমকুলে বিলাস করে।

এই যে আধমরা দেহটা অচেতন হয়ে পড়ে আছে ডোম্বীর সামনে, তার দিকে তাকিয়ে দেখল ডোম্বী। কে এই মানুষ? মুখের মাঝে যন্ত্রণার চিহ্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা যায় তাদের মতন সাধারণ মানুষ এ নয়। যুবক দেহ, অভিজাত বংশের কেউ হবে। হাতে-পায়ে আঘাতের চিহ্ন। কোনো যুদ্ধের বলি নাকি? রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়। এ কি কোনো সেনাপতি? এই অঞ্চলে তো কোনো যুদ্ধের সংবাদ পায়নি তারা। তাহলে কোথা থেকে এল এই দেহ?

কী হয় যুদ্ধ করে? কী হয় এর জায়গা ও দখল করে নিলে? ডোম্বীর মন উদাস হয়ে যায়। ওই যে হরিণের মৃতদেহটা টাঙিয়ে রেখে এল তারা, সেই

হরিণকে মারা হয়েছে তো পেটের ভুখ মেটাতে। কিন্তু মানুষে-মানুষে লড়াই কেন হয়? মানুষ তো মানুষের মাংস খায় না। তাহলে কীসের লড়াই? ইস্, কত ফুটফুটে এই গাভুর যুবক। কতই বা বয়স! এই কি সময় হয়েছে ওর মরে যাওয়ার? কে এমনভাবে আঘাত করল তাকে?

রাআ রাআ রাআ অবর রাঅ মোহেঁ রে বাঁধা
লুইপাঅপসাএ দারিক দ্বাদশ ভুবণে লাধা।

এ কী? এ কী কথা শুনল ডোম্বী গানের সুরে? রাজা, রাজা, রাজা, রাজাই মোহে বাঁধা; লুইপাদের প্রসাদে দারিক দ্বাদশ ভুবন লাভ করে। সে লুইপা কোন ভুবন লাভ করেন, সে-সব অনেক ভেতরের কথা। তিনি সিদ্ধযোগী, মহাপুরুষ। আমরা সাধারণ মানুষ তো আর তা নই। আমরা চলি রাজা যেমন চালায়। কিন্তু রাজাই নাকি আসলে মোহে বাঁধা? ডোম্বী তো এই কথাই ভাবছিল এতক্ষণ। রাজাই আসলে মোহে বাঁধা পড়ে আছে। মোহে তাই রাজার কাছের মানুষগুলোও। রাজাই হল সকল প্রজার বাপ-মা। রাজা যদি মোহে পড়ে থাকে তাহলে প্রজারা কি তার থেকে মুক্ত হতে পারে?

ধুর, এত কথা ভাবতে ডোম্বীর ভারী বয়েই গেছে। ডোম্ব ফিরে এলে গাভুরের দেহটা তুলে দেবে মল্লিনাথের চেলাদের হাতে। তারপরে মা গঙ্গার পাড়ে পাকুড়গাছটার ডালে ঝোলানো হরিণের মাংস নিয়ে সোজা চলে যাবে ঘরে। বড্ড পরিশ্রম হয়ে গেছে আজ। কষিয়ে রাঁধতে হবে মাংস। আদা আর গোলমরিচ এনে রেখে দিয়েছে গেল হপ্তায় হাটে মাংস বিক্রি করে পাওয়া কড়ির বিনিময়ে। মাংস আর ধান্যমদ। আজ রাতে অন্য কিছু ভাবতে আর রাজি নয় ডোম্বী।

***

"চর্যাপদের এক পদকর্তা ছিলেন দারিকপাদ। সে নাহয় বুঝলাম। কিন্তু গাভুর মানে কী, সুজয়?"

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের ভেতরে গঙ্গার ধারে বসে কথা বলছিল কলেজ-জীবনের দুই বন্ধু অনেক বছর বাদে। শ্রীরামপুর কলেজে নব্বইয়ের দশকে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ত সুজয় আর অনিন্দ্য। সে-সময়ে বেশ হৃদ্যতা ছিল। পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াতও ছিল। পরে কর্মজীবনে দু'জন দু'দিকে চলে যায়। দু'জনের মধ্যে হৃদ্যতার কারণ ছিল কয়েকটি বিষয় নিয়ে— গান, আধ্যাত্মিকতা আর ইতিহাস। কত দুপুর, কত বিকেল এসব নিয়ে আলোচনা করে কেটেছে একসময়। কর্মজীবনে দীর্ঘসময় একজন সরকারি চাকরি এবং অন্যজন বেসরকারি ব্যাঙ্কে কাটিয়ে এলেও এ-সব নিয়ে যে আগ্রহ কোথাও রয়ে গিয়েছে তা টের পেল অনিন্দ্য, সুজয়ের কথা শুনে। সুজয় যে

এ-সব নিয়ে চর্চা ছাড়েনি, তা কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। অনিন্দ্যর শুনতে ভালোই লাগছিল।

"একসময় রাঢ় বাংলার লোকেদের মুখে 'গাভুর' কথাটির মানে ছিল নবীন সুদর্শন যুবক", অনিন্দ্যের প্রশ্নের উত্তরে সুজয় বলল।

"ওই গাভুর যুবকের কী হল জানার আগে একবার চর্যাপদ নিয়ে ছোটো করে বলে দে, ভাই। সেই হায়ার সেকেন্ডারির বাংলাতে আমাদের পাঠ্য ছিল। মন দিয়ে সেই সময়ে পড়িনি। কীসব ছিল 'কা আ তরুবর-টরুবর' ইত্যাদি", বলেই একগাল হেসে ফেলল অনিন্দ্য।

"ভাই, চর্যাকে আমরা কবিতা মনে করি সাধারণত। আসলে এগুলো হল গান। অনেকটাই বাউলদের গানের মতন। গানের কথায় সাধনজগতের কথা থাকত। নানা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথাও থাকত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীজি একশো বছর আগে নেপালে এ-রকম পঞ্চাশটি গান উদ্ধার করেছিলেন। গানের মাথায় রাগ-রাগিনীও লেখা ছিল। পদকর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, ভুসুকুপাদ, কুক্কুরীপাদ ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। পঞ্চাশটি গানের বাইরেও গান ছিল, সে-কথা টীকাকার মুনিদত্ত বলে গিয়েছিলেন। মুনিদত্তের টীকাগ্রন্থ সমেতই শাস্ত্রীজি উদ্ধার করেছিলেন।"

"এ-সব গানের সময়কাল কী?"

"পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তবে মোটামুটি অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ... "

"অর্থাৎ পাল রাজবংশের সময়কালের সঙ্গে একেবারে খাপে-খাপ", সুজয়কে শেষ করতে না দিয়েই অনিন্দ্য বলে উঠল।

হাসল সুজয়। বলল, "এইজন্যই তোকে এত ভালোবাসি। একেবারে ঠিক জায়গায় ধরেছিস। পালযুগ এবং চর্যাপদের যুগ একেবারে সেম-সেম। অথচ দুইয়ে মিলিয়ে কোনো ইতিহাস আমাদের সামনে কেউ তুলে ধরেননি আগে।"

"এবং সেই কাজটা তুই করতে চাস, তা-ই তো?"

শরতের বিকেল। বেলুড়ে গঙ্গার ধারের পরিবেশ বেশ মনোরম। মৃদুমন্দ হাওয়া চলেছে। পড়ন্ত বিকেলের রোদ পেছনের দিকে। পূর্বে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসেছিল দুই বন্ধু। অনিন্দ্য তাকিয়ে দেখল সুজয়ের দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছু একটা ভাবছে মনে হল। কিছুক্ষণ বাদে অনিন্দ্য খোঁচা দিল, "কিছু বললি না তো?"

"যা কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গিয়েছে, তা দিয়ে কিছু-কিছু মিসিং লিঙ্ক জুড়ে একটা ইতিহাস খাড়া করতে পারি, অনিন্দ্য। কিন্তু বেশ কিছু অসুবিধাও আছে", সুজয় থেমে-থেমে বলল।

"যেমন?"

"পাল রাজাদের রাজত্ব সাড়ে চারশো বছরের। এই দীর্ঘ সময়ের কোনো রাজবাড়ি জাতীয় কিছু পাওয়া যায়নি। এটা খুব আশ্চর্যের। অথচ এমন কিছু পুরোনো নয় এই ইতিহাস। এদিক-ওদিকে পাওয়া কিছু তাম্রশাসন বা মূর্তিলেখই সম্বল। প্রস্তরলেখ পাওয়া গিয়েছে নামমাত্র। এর ওপরে বৌদ্ধবিহারগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং সেখানকার সমস্ত পুঁথিপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ায় লেখ্য উপাদান প্রায় নেই।"

"লামা তারানাথের বই?"

"এই এটা বললি বলে ভালো লাগল। সেখানে পাল রাজাদের যা বংশতালিকা উনি লিখেছেন তা পাতে দেওয়া যায় না। দেবপালকে ধর্মপালের আগে বলেছেন। এমন সব রাজাদের নাম বলেছেন যার কোনো অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায়নি।"

"তাহলে?"

"তাহলে আর-কি! আমি গল্পের মতন করে বলে যেতে পারি এ-যাবত পড়াশোনা করে যা বুঝেছি। তুই কি শুনবি?", সুজয় প্রশ্ন করল বন্ধুকে।

"কেন শুনব না। একশোবার শুনব। ইতিহাসের গল্প শুনতে আমার ভালোই লাগে। কিন্তু গাভুরের কথাটা শেষ কর আগে।"

"বলছি। তবে তোর মনে হচ্ছে না যে এক কাপ করে চা হলে ভালোই হত?"

"সে তো ভালোই। তবে গেটের বাইরে যেতে হবে তাহলে।"

"সে চল। আবার নাহয় ফিরে আসব। চা খেতে-খেতে তোকে একটা অন্য কথা বলি বরং।"

গঙ্গার ধার থেকে বেলুড় মঠের পশ্চিমের গেট পর্যন্ত আসতে লাগে পাঁচ মিনিট। গেটের বাইরে চা-সিগারেটের দোকান। সেখান পর্যন্ত হেঁটে আসতে-আসতে সুজয় বলল, "ধর্মতলাকে চৌরঙ্গী বলে জানিস তো?"

অনিন্দ্য মাথা নাড়ে।

"চৌরঙ্গী কেন নাম হয়েছে জানিস?"

"চৌ বা চার মাথার মোড় বলে?"

হাসল সুজয়, "তুই জানিস। আমাকে দিয়ে বলাবার জন্য মজা করছিস!"

এবার হাসল অনিন্দ্য। বলল, "চৌরঙ্গীনাথ নামে একজন যোগীর নামে নাকি এই নাম। ওঁর আশ্রম ছিল এই অঞ্চলে। সে-সময় অবশ্য ঘন জঙ্গল ছিল সেখানে।"

"এই তো", খুশি হল সুজয়। হেসে বলল, "চৌরঙ্গীনাথের সমাধি রয়েছে কলকাতায়, সে-কথা জানিস?"

এবারে চমকে ওঠে অনিন্দ্য, "বলিস কী? কোথায়?"

"ময়দান থানার পেছনে এক শিব মন্দিরের নীচে।"

"ময়দান থানা? মানে নন্দন চত্বরের কাছেই?"

"ইয়েস, বন্ধু! আমার মোবাইলে সেই শিব মন্দিরের ছবিও আছে। এই দ্যাখ।"

"এটা তো জানতাম না রে! এই নিয়ে তুই কিছু লেখ, ভাই", অনিন্দ্যর গলায় প্রশংসার সুর।

"হুম্‌ম্", সুজয় মুচকি হেসে মাথা নাড়ল।

"কিন্তু ভাই, বলছিলি গাভুরের কথা, চলে এলি চৌরঙ্গীনাথের কথায়। কিছু কি সম্পর্ক আছে এর মধ্যে? থাকলে বল।"

সুজয় সম্মতিতে মাথা নাড়ল দেখে অনিন্দ্য আবার বলল, "বল তাহলে।"

"মল্লিনাথের আশ্রমের কথা বলেছি শুরুতেই। চর্যাপদের পাশাপাশি বাংলায় তখন নাথযোগীদেরও নানান কীর্তি পাওয়া যায়। চৌরঙ্গীনাথ এমনই একজন।"

"বুঝেছি। বল তাহলে তাঁদের কথা", অনিন্দ্য আগ্রহ দেখাল।

"কিন্তু সে-কথা বলার আগে আমাদের সেই সময়ের ইতিহাসটা নিয়ে কিছু বলব। বিশেষ করে মাৎস্যন্যায়ের পরের পর্বের কথা। সে-কথা না বলা হলে গাভুরের কথা বুঝে নিতে একটু অসুবিধা হবে।"

"তবে তা-ই বল, গুরুদেব! চল, সেই গল্পটা আগে শুনি গুছিয়ে। বসি চল গঙ্গার ধারে। এই গঙ্গার তীরেই তো ডোম্বী আর ডোম্ব খুঁজে পেয়েছিল গাভুরের অচৈতন্য দেহ, তা-ই তো?"

"কেবল গঙ্গার পাড়েই নয়, গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে", অনিন্দ্যের পিঠ চাপড়ে দিল সুজয়। আনন্দ ওর চোখেমুখে। বলল, "যে পাড়ে আমরা রয়েছি এখন, সেই পশ্চিমপাড়ে। চল, সেই গল্প তোকে বলি, বন্ধু।"

"চল, তা-ই হোক তবে।"